Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501078 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Poet Beetashok Bhattacharya: A Review
কবি বীতশোক ভট্টাচার্য: একটি পর্যালোচনা

Bhagbat Shit
Researcher
Bengali Department
RKDF University Ranchi, Jharkhand

Received on: 07th May 2026
Accepted on: 19th May 2026

Abstract:
Beetashok Bhattacharya (16 April 1951 – 14 July 2012) stands as one of the most distinguished poets and essayists of the post—Jibanananda era in Bengali literature and is widely regarded as a leading poetic voice of the 1970s. Above all, his foremost identity was that of a poet. His literary debut came with the publication of the poem "Kokhono Pagol" ("Sometimes Mad") in 1969 in Kobi O Kobita, edited by Jagadish Bhattacharya. His first and only independently published volume of poetry, Shilpa ("Art"), appeared in 1986, followed by several other notable collections. Significantly, the corpus of his uncollected poems far exceeds those included in published volumes.

For more than four decades, Beetashok Bhattacharya pursued poetry with remarkable dedication, continually reshaping both its thematic concerns and aesthetic idiom. The exceptional artistic merit of his work has made it a subject of enduring admiration and critical engagement, while its lyrical beauty, intellectual depth, and expressive power continue to captivate readers. His extensive literary exposure from an early age, coupled with a wide—ranging intellectual cultivation, established him as an original and distinctive poetic voice within modern Bengali literature.

This study is a humble endeavour to acquaint contemporary readers with the rich literary legacy of Beetashok Bhattacharya. It aspires to encourage broader scholarly engagement with his oeuvre and to foster a deeper appreciation of his enduring contribution to Bengali literature and culture.

Key Words:
Poet Beetashok Bhattacharya, originality and distinct identity, lexicologist, conscious poet

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই তিনি তরুণ-তরুণতরদের শ্রদ্ধা ও অগ্রজদের ভালোবাসা 'শুভ ইচ্ছা' অর্জন করে নিয়েছিলেন। গদ্য মুখর বাংলা কবিতার আবহে তাঁর কবিতার ধ্রুপদী অবয়ব শৈলী, স্বনির্মিত ভাষা ও ভাবকল্পনা মিশ্রিত মনন যে কোনো বাংলাভাষী কবি ও কবিতা পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ। বীতশোকের অসাধারণ মেধা, স্মৃতি, অনুভূতি, কল্পনা এবং দেশ-বিদেশের সাহিত্য-শিল্প, ধর্ম-দর্শন, সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব প্রভৃতিতে এক সুগভীর বিদ্যাবত্তা বীতশোকের কবিতাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। রসাস্বাদের জন্য তাঁর কবিতা বারংবার পাঠে দাবি করে।

বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১-২০১২) তাঁর কবিতায় তাঁর নিজস্ব কাব্য শৈলীতে নতুন এক কাব্যভুবন রচনা করেছেন। যা তাঁর সমকালের থেকে অনেক ব্যতিক্রমী। তাঁর কবিতা মূলত অস্তিত্ব অন্বেষণের মাধ্যম থেকে নান্দনিক শিল্প রূপের দিকে এগিয়ে গেছে। বাংলা কবিতার একটি নতুন দিগন্তের স্রষ্টা বীতশোক ভট্টাচার্য। কেবলমাত্র বাংলা কবিতা নয় অন্য ভাষার কবিতার অনুবাদ, বাংলা সমালোচনার ধারক ও বাহক তিনি। তুলনামূলক ভাষা-সাহিত্য চর্চায় ও বিশ্লেষণে তিনি সৃজনশীল।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতার বই একটি শরিকি কাব্য সংকলন। আরো দুজন কবির সঙ্গে (রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, মণীন্দ্র গুপ্ত) যৌথ ভাবে 'তিনজন কবি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪এ। তাঁর শেষ কবিতার বই 'জলের তিলক' (আনন্দ পাবলিশার্স) প্রকাশিত হয় ২০০৩এ। এছাড়া বীতশোকের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (বাণীশিল্প, প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুআরি ২০০৪। এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়েছে — 'এসেছি জলের কাছে'(১৯৮৬), 'শিল্প'(১৯৮৬), অন্য যুগের সখা'(১৯৯০), 'নতুন কবিতা'(১৯৯২), 'নীল একপাতা'(১৯৯৬), 'দ্বিরাগমন'(১৯৯৭), 'বসন্তের এই গান'(২০০১), ''কবিতা সংগ্রহ''(২০০১), 'প্রোদোষের নীল ছায়া'(২০০১)। তাঁর অনুদিত দুই উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ হলো — 'আজারবাইজানের প্রাচীন কবিতা' (১৯৭৮) এবং 'জেন কবিতা'(১৯৯০)। বীতশোকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে — 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'। যার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮৮ সালে, ইংরেজি ১৯৮১।

বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'তিনজন কবি' শরিকি সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে তৎসম শব্দের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ করি বহুল চিত্রকল্পের ব্যবহার। এই শরিকি কাব্য সংকলনের কবিতাতে জাপানি কবিতার অনুরণন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কবি অনুভূতি প্রকৃতি এবং বাস্তব থেকে শিল্পের দিকে উত্তোলন আবার কখনো বা শিল্প থেকে ফিরে ফিরে চরম বাস্তবতায় অবগাহন। এই আসা–যাওয়ার দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে, নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে —

"কী আনন্দে ফেরালে এই সামগ্রীসমূহ আজ ফেরালে কী আনন্দে:
পাহাড়তলে জেগে উঠত ধাপে ধাপে তুষার — শহর, তুমি কী সুবর্ণে
কী রৌপ্যে তার রঙ ধরালে; এই ফোয়ারার পাথর আভার ছন্দে
সুর বাঁধল একটু সময় এবং তারপরে তাকে তার নিজস্ব স্বর্ণে
ফিরিয়ে দিলে কেমন ক'রে; যে ছিল সে ছিল সহসা বাহুবন্ধে
ফিরেছিল, যেভাবে ফেরে মানুষ গৃহের গৃহীর গৃহদ্বন্দ্বে,
এবং তাদের উচ্চকিত সুস্পষ্ট অক্ষর যেন অনুবাদের বর্ণে
প্রত্যাহার করিয়ে নিলে, স্থগিত করিয়ে রেখে দ্বিপ্রহরের সন্ধে
কী আনন্দে ফেরালে সামগ্রীসমূহ আজ ফেরালে কী আনন্দে!"[১]

এই কবিতায় বীতশোক প্রকৃতিকে শিল্পে রূপায়িত করেছেন। এখানে প্রকৃতির রূপ এবং শিল্প রূপের খণ্ড খণ্ড ছবি উঠে আসে। কবিতাটি বর্ণ ও রঙে কবির নিজস্ব মুন্সিয়ানায় ভরপুর। 'ফোয়ারার পাথর আভার ছন্দে সুর বাঁধলো একটু সময়'— পঙক্তিতে পাথর ও স্থাপত্য শিল্প ভাবনা অবিরল পরিভ্রমণশীল। আবার এখানে বাস্তবের সাংসারিক জীবন রূপান্তরিত হয় গূঢ় শিল্প বোধে।

'তিনজন কবি' সংকলনের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা হলো 'কৃমি'। এক একটি প্রসঙ্গা সূত্রের হাত ধরে অন্যদিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান। সর্বোপরি কবিতাটি হয়ে ওঠে সর্বব্যাপী, অনেক পাঠের স্মৃতি ও মেধা কবিতাটিকে তন্ময়তার দিকে অগ্রসর করায়। কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা টানাপোড়েনের নকশা ফুটে ওঠে:

"ঘুমের আগে ক্রিমসন রঙের কাগজের কাছে একবার
অভ্যাসে ঢুলে পড়েছিলাম আমি, একবার
অভ্যাসে চমকে উঠে পেয়েছিলাম কলমের মুখে
তোমার বমির স্বাভাবিক গন্ধ, একবার
যেন তার আগে কোনোদিন কিছুতে শিশুমুখের
অম্লতা পাই নি আমি কখনো
পাই নি কোনো ক্ষীণ আত্মগত টকজল একঝলক
জাগরণক্লান্ত চিন্তায় উঠে আসা
অথবা পাই নি তোমার মুখের পানপাতাছায়া ও ঘামতেল।
পরস্পরের বিরুদ্ধতায় সিঁড়ির তলার মুখোমুখি খুঁড়ে খাওয়া
চুম্বন এক দীর্ঘ মন্ত্র সুড়ঙ্গা এক শীর্ণ শব্দ সংস্কৃত ও গ্রিক
উভয়দিকেই মুখ ও পায়ু উভয়দিকেই প্রজনন ও মৃত্যু
প্রেম ও শিল্পের চক্রান্ত
হা কৃমি হে ক্রিমি যা কৃমি যে ক্রিমি
তোমাদের আমি ফিরে পেয়েছিলাম যেন একবার
অভ্যাসে ক্রিমসন রঙের কাগজের কাছে।"[২]

এই কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচক ড. নিতাই জানা মহাশয়ের মন্তব্য ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে বলে মনে করি — "এখানে চুম্বন আর মন্ত্র-এ দুই-ই মুখ সংশ্লিষ্ট। চুম্বনের সঙ্গো প্রেম, মানবিক সম্পর্ক যেমন তেমনি মন্ত্র সূত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা স্মৃতিতে উঠে আসে। লক্ষণীয়, সুড়ঙ্গা শব্দটি। এখানে গ্রিক Surinkos এবং সংস্কৃত বা তারও আগের ইন্দো-ইউরোপীয় সুরঙ্গা শব্দের মিলন ঘটেছে। সুড়ঙ্গোর দুটি মুখ যেমন কৃমিরও তাই। প্রজনন ও মৃত্যু-এমন এক উভযোজ্যতায় এ কবিতার বয়ন। মুখ আর পায়ু, প্রেম আর শিল্প ক্রিমসন রঙের কাগজে ফুটে ওঠে। ক্রিমসন শব্দটি আরবী qirmiz এবং সংস্কৃত ক্রিমি শব্দের থেকে পাওয়া। চুম্বনের প্রেম, সুড়ঙ্গোর শিল্প আর ক্রিমি থেকে ক্রিমসন, মৃত্যু থেকে লাল রঙ দুটি দিকে যেতে চায় এ কবিতায়।"[৩]

কবি বীতশোকের ব্যক্তি জীবন ও শিল্প জীবনের সার্থক সমন্বয় দেখা যায় তাঁর 'তিনজন কবি' কাব্য সংকলনের 'মা ও সন্তান জানে' কবিতার মধ্যে। কবি এখানে মা ও সন্তানের চিরন্তন ঘরোয়া আখ্যানকে ভালোবাসার নতুন আবহে আমাদের জানিয়েছেন:

"মা ও সন্তান জানে এইবার এই ঘরে ভালোবাসা হবে;
অথবা জানে না তারা, জানে এই ভান করে, কিন্তু তবু হয়
ভালোবাসা… কী তার প্রস্তুতিপর্ব, কিশোর সভয়
অথচ কী সপ্রতিভ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সর্বাঙ্গা বাথটবে
না ডুবিয়ে মাও তার উবু হয়ে বসে আছে; নগ্ন কাঁধ, পিঠ
যেখানে দ্বিখণ্ড ক'রে তরবারি চলে যায়, সেই শিরদাঁড়া
তাঁর খাঁজে খাঁজে আজ যদি মলিনতা জমে, দিন দিন যারা
মরিচা প্রহরা দেয়, তারা তবে ভুলে যাবে, উদার সরিৎ

© Santiniketan Sahityapath

নির্মন্থন ভুলে গিয়ে নিজের স্রোতের কাজে বয়ে যাবে, আর
এ গৃহ তাহলে যদি অকাতরে ভেঙে যায়, সন্তান তাহলে
নিজের দেয়ালে যদি ধাক্কা খেতে চলে যায়, তাই এ তোয়ালে
কর্কশ, প্রখর আর স্পঞ্জও গঞ্জনাময়, সাবানের ওই স্নেহ, ক্ষার
সহ্যে মা'র দেহ জাগে, 'ময়লা ঘুমোক' বলে ও পিঠে কিশোর
ভালোবাসা ঘষে দেয়, এমনই উন্মুখ পৃষ্ঠপোষকতা ওর!"[৪]

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতার মধ্যে ভারতবর্ষের চিরায়ত ইতিহাস ও লোকায়ত জীবন বার বার ঘুরে ফিরে আসে। বীতশোকের কবিতার মূল শেকড় সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে ভূমিতে। তাঁর ধ্যান জগৎ কখনো কালিদাস আবার কখনো বা রবীন্দ্রনাথে মগ্ন। বীতশোকের কবিতা একটা সংশ্লেষ থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে চলেছে নিরন্তর।

'এসেছি জলের কাছে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল — আশ্বিন ১৩৯৩ সালে। এই কাব্যের দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় জানুআরি ১৯৯৫, কলিকাতা পুস্তক মেলায়। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ (ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর)। এই কাব্যগ্রন্থটির বাংলাদেশের পরিবেশক হলো 'পাঠক সমাবেশ' (১৭এ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০)। হাওয়া-আলো, জল ও অন্ধকার নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে। স্বল্প আয়তনের ষোলটি(১৬) কবিতার এই গ্রন্থটি পাঠক ও সমালোচক মহলে বেশ অভিনন্দিত। 'এসেছি জলের কাছে' কবিতা গ্রন্থটি কবির মৃত্যুর পর ইংরেজিতে অনূদিত হয় — 'Come Near Water' নামে (Translation Pradeepan Dasgupta) বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় — জুন ২০১৮, প্রকাশক মনফকিরা।[৫]

'এসেছি জলের কাছে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি ইতিহাস চেতনা ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই কবিতার কাব্যমূল্যও বহু ব্যাপ্ত। কবিতাটি নিম্নরূপ:

"এসেছি জলের কাছে পীড়িত খরার দেশ থেকে।
যেখানে চোখের কালো মণি থাকে এখন সেখানে
কাজললতার মতো এক নদী খুলে যায়; পথের দুধারে
পাথর মেঘের স্তূপে; প্রতিধ্বনি থেমে গেল বিস্তৃত দুপারে।
দেখা যায় হাল পড়ে, স্তব্ধ চাপা ভাটিয়ালি দীর্ঘ গুণ টানে
মেটেবুরুজের মতো থমথমে কে কিশোর, আমি তাকে দেখে
হঠাৎ ডাকতে যাবো, আর অমনি অসিতাভ অনেক কিশোর
অনেক নৌকায়, আর প্রত্যেকেই হেরে যাবে যেন এই বাচে
এত দ্রুত যায় আজ। দুপাশের ঢেউ চুপ; ফিরে তাকায় না
কেউ আর আমার দিকে; আমার বিয়ের দিন যে হাত—আয়না
মসৃণ দেখাতে গিয়ে সিঁদুরচর্চিত মুখ বাষ্পে শ্বাসে কাঁচে
ঠেকে গিয়েছিল আজ জলকিশোরেরা কারও চেয়ে বেশি নিরুত্তর।"[৬]

বীতশোকের 'এসেছি জলের কাছে' কাব্যগ্রন্থের 'তল' কবিতাটি চারটি স্তবকের। এই কবিতাটির প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামলী' নামক বাড়িটির কথা। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের উদ্যোগে 'শ্যামলী' বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথের ৭৫ তম জন্মদিন (১৯৩৫) উপলক্ষ্যে পদার্পণ ঘটে। এবার বীতশোক ভট্টাচার্যের 'তল' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

"দিই নি শ্যামলী নাম ওর;

© Santiniketan Sahityapath

আমার মাটির বাসা এই।
এর মেজে এমন নিকোনো
নতুন বউয়ের যেন মুখ।
জানতেন শিল্পীরা পুরোনো
গোময়ের লেপন পড়লেই
গুহায় নিহিত ফোটে রূপ।
জানতেন টোলার কুমোর
প্রতিমা আসলে একমেটে।
ফলে এই লেপামোছা ঘর —
কার ছিল দুহাত নোয়ানো;
কেউ ছিল কখনো তৎপরঃ
ছড়া দিতে, নিছিয়ে মোছাতে।
আর আজ চিড় ফাট-ধরা
মেজে করে ক্রমাগত হাঁ।
কেউ নেই যে তেমন হাতে
মুছে দেয় সব নিরুত্তর।
মেজে ভর্তি না-এর আলপনা।"[৭]

এই কবিতার প্রথম স্তবকে বলা হয়েছে, মাটির বাড়ির কথা। ঠিক বাড়ি নয়, বাসা। বুঝিবা বাসযোগ্য বাসা। এই বাসার মেজে অর্থাৎ তল এমন নিকানো আদরণীয় ও সুন্দর যে, যেন নতুন বউয়ের মুখ। বাড়ির মেজে আর নতুন বউয়ের মুখ — এই তুলনা সৌন্দর্যের সীমানা স্পর্শ করে থাকে। একটি সুন্দর বাসা আর নতুন বউয়ের মুখ। বীতশোক দেখিয়েছেন, মেজেতে ফাটল ধরে নতুন বৌও পুরাতন হয়ে যায়, নতুন বউয়ের যৌবন ও সৌন্দর্য হয় অপগত। কিন্তু বাড়ির মেজের ফাটল মেরামত করা গেলেও বউ অবদলযোগ্য, অপরিবর্তনীয়। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ফুটে ওঠে কুমোর টোলার প্রতিমা শিল্পীদের কথা। প্রতিমার আসল রূপ ফুটে ওঠে একমেটে অবস্থাতেই অর্থাৎ খড়, মাটি দিয়ে গড়া প্রতিমার পূর্ণায়ত সৌন্দর্যের সূচনা। কবিতার তৃতীয় স্তবকে উঠে আসে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরানো আচার — ছড়া দেওয়ার কথা। পল্লী বাংলার গ্রামের বাড়িতে চারপাশে গোবর জল গুলিয়ে হাত দিয়ে ছড়া দেওয়া হয় সূর্য ওঠার আগেই। চতুর্থ স্তবকে বর্তমান ঘরের চিত্র ফুটে ওঠে। মেজেতে ক্রমাগত বড়ো বড়ো ফাটল। ফাটলগুলি যেন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত। আজ 'মেজে ভর্তি' না — এর আলপনা। আসলে এ আলপনা হলো ফাটলের। যা মেজেকে করেছে দীর্ণ-বিদীর্ণ। আবার এই কবিতার নামকরণ 'তল' শব্দটি অঙ্কের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক এক ক্ষেত্র বিশেষ বুঝিয়ে থাকে। শিল্পীর কাছে বিশেষত চিত্রশিল্পীর কাছে 'তল'এর গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৮৬তে প্রকাশিত হয় 'শিল্প' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের মধ্যে কবিতার সংখ্যা ৬৬। বীতশোকের 'শিল্প'র অন্তর্গত 'ফল' কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি নির্মাণ করা হয়েছে ১৬টি লাইনে। এখানে আট আট ছত্রের তৈরি দুটি অংশ বেশ স্পষ্ট:

"জেগে উঠেছিলে, একাকী, পক্বযুবতী;
তরুণ বাতাসে বক্ষ, জঙ্ঘা দোলাচল;
স'রে যাও; তবু কামড়িয়ে ধরি ও কটি;

© Santiniketan Sahityapath

আমরা, তোমার কীটরাশি, তুমি রাঙা—ফল।
দোলো, স'রে যাও; যা তোমার সম্পর্ক
লতায়—পাতায়, আত্মীয় এত, অজানা!
তবু দুলে ওঠো, যেন আলো, নীল স্বর্গ
তোমাকেই ডাকে; অপ্রাপণীয়া তুমি, মা।
লাবণ্যলতা, ভর করো দেহযষ্টি;
স'রে যেতে থাকো, তোমার ছেলের বউরা
বিস্মিত, দ্যাখে... কতদূর, এক প্রৌঢ়া
যৌবন নিয়ে চলে যান, তাঁর যষ্টি
অশীতিবর্ষ... কী যে শীত, কত বর্ষা
পার হয়ে গেল, তবু তাঁকে প্রতি রাত্রে
সম্ভোগ করে এক উষ্ণ আলো, হাতড়ে
রাখে লঘুভার তাঁর ফল: রোগা, ফরশা।"[৮]

'শিল্প' কাব্যগ্রন্থের পাঁচ লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হলো 'অস্তি'। এছাড়া 'ভোরবেলা' কবিতাটিও সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না কিছুতেই —

"ভোরবেলা জেগেছ তুমি দেখেছ ডাঙায় পড়ে আছ
ঘোর ভাঙিয়ে গিয়েছে কেউ এবার তোমায় ঘুম পাড়াবে ব'লে
জল সরে গিয়েছে বালি পায়ের পাতার কাছে পাড় ঝাউবনের কালো
বেড় দিয়ে উঠেছে কোথায় নীলচে চোখে আকাশ
একবার তাকিয়ে পাতা নামিয়ে নিল আরেকটা চোখ কালো
লম্বাটে ওই নৌকো দ্যাখো কাজল কাদায় উলটে পড়ে আছে
কাল সারারাত জলের ভেতর কী যেন এক জ্বরে
খালি উথাল পাথাল হলো ঢেউয়ের ডোরা ডোরা
নীলচে শাদা চাদর ছিঁড়ে হাঙর হাঙর হাঙর
স্বপ্নে ছিঁড়ে খেতে এসে আবার ফিরে গিয়ে
ইঁদুর লেলিয়ে দিল লাল কাঁকড়ার দাঁড়া
এখনো গায়ে আটকে আছে ঝিনুকখোলা শামুক
জলজ উদ্ভিদের ওই ভেষজগুণ সমেত
তুমিও যেন শুষে নিয়েছ ভোরবেলা তাই জ্বর নেমেছে তোমার।"[৯]

এই কবিতায় ছত্র সংখ্যা ১৪। শব্দ সমবায় গুলি চোখে পড়ার মতো। শব্দের আনুপাতিক হার প্রায় ৩:২।

কবি বীতশোকের বহু স্বর ও সুরের ঐক্যতান প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর 'অন্য যুগের সখা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। আসলে এই কবিতায় একটি তান নয় অনেক তান আমাদের কানে এসে বাজে। কাব্যগ্রন্থটি কবির পরিণতির সূচক বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ এখানে কবির সহজাত শৈল্পিক দক্ষতা চূড়ান্ত রূপে বিস্তারিত হয়েছে। 'অন্য যুগের সখা' কবিতা বইয়ের একটি কবিতা হলো 'অপর্ণা শরীর নিয়ে'। কবিতাটি হলো নিম্নরূপ:

"অপর্ণা শরীর নিয়ে চলে এলে এই শুষ্ক দেহের একপাশে।

কপিশ অস্থি ও কাঠে আভা ওঠে, দাবানল দূরতম বনে
বৃক্ষের সংঘর্ষে জ্বলে, আর প্রতিহত দেহ দেহের উত্তাপে
স'রে যায় সারারাত, আমাদের সব স্নায়ু শৈত্যের ঘর্ষণে
টান টান হয়ে আছে; এসো, স্থবিরতা এসো, জ্যোৎস্নায় কার্পাসে
উড়ে যায় আমাদের সঞ্চিত ভিক্ষার ফল, নিঃস্ব আয়োজনে
দাঁতে দাঁতে ঠেকে যায় কঠোর চুম্বন, আরো শীত ওষ্ঠে কাঁপে
আকাঙ্ক্ষা, বেদনারাশি, ওই স্তূপ আকন্দের অঞ্জলি উচ্ছ্বাসে
ফেটে গিয়ে প'ড়ে আছে, তোমাকে বহন করি আজ অপ্রতাপে
ও রোদন লঘুভার কঠিন কঠিনতম নীলাভ আকাশে।"[১০]

উক্ত কবিতাটির প্রেক্ষাপটে 'কুমার সম্ভব'এর অপর্ণা ও মহাদেবের সাক্ষাৎ ও তাদের পারস্পরিক প্রেমভাব সংযোগের কথা রয়েছে। পার্বতী, উমার আর এক নাম অপর্ণা, কারণ তিনি ব্রতকালে পত্র ভক্ষণ ও ছেড়ে দিয়েছিলেন। অপর্ণ শব্দের অর্থ হলো পর্ণহীন বা পত্র শূন্য। কপিশ শব্দের এক অর্থ যেমন পিঙ্গাল বর্ণ বা বাদামী তেমনি মহাদেবকে ও কপিশ বলা হয়। বীতশোক এই কবিতায় দুই মানব-মানবীর অবস্থান বিরাট এক কালিক দৈর্ঘ্যের ইঙ্গিতে দিয়েছেন। সেই আদিম মানব-মানবীর প্রেমের কথা এখানে চিত্রিত হয়েছে — যারা বনে পর্ণাহার ও ভিক্ষা সামগ্রী সম্বল করে বেঁচে থাকতেন। শীত যাদের কাতর করলেও কাঙ্ক্ষিত মিলনে নিয়োজিত করত। আদম-ইভের প্রথম সাক্ষাতের কথা অপর্ণা-শিবের, হিন্দু পুরাণের আদি প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের চিহ্ন এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

'অন্য যুগের সখা' কাব্যগ্রন্থের একটি অভাবনীয় দ্যোতনা সঞ্চারী কবিতা হলো 'ভাসান'। কবিতাটির চার পঙক্তি করে তিনটি স্তবক গঠিত। কবিতাটি:

"যেন নিয়মিত মাটিতে পা নেই, হালকা;
কী টালমাটাল। ভালো লাগে এত; উড়ছে
খোলা চুল; আমি হাওয়ার শরীর; আলগা
আলগোছে যেন ভেসে আছি এক গুচ্ছে।
ভেসে যাই, ফেনা, নীল শাদা ফুল; কার গা
এ হাতে ঠেকল: আমার, আ-মার! উপছে
পড়ি পেয়ালার রোদ জরি-কাজে, কাল চা
দিতে গেছি যেই কাঁপা হাতে তুলে... ডুব সে
দিল এই চোখে; কেন দিল। আমি উঠছি
তবু দ্যাখো ভেসে: আমি শোলা, গাটাপার্চা
কী সব দিয়ে যে তৈরি শরীর, হালকা
অলকমেঘের মাঝখানে এই উঁচু একগোছা কুর্চি।"[১১]

জলাশয়ে প্রতিমা ভাসিয়ে দেওয়া কে 'ভাসান' বলে। আবার মসনা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোকগীতিকেও 'ভাসান' বল হয়ে থাকে। এ কবিতায় শরীরের গঠনের কথা বলা হয়েছে। শরীরে নানা অংশের কথা আছে। আর আছে শরীর গঠনের উপাদানের কথা। এই কবিতায় কবি শরীরী অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা ও শরীরের উপাদান বিষয়ক জিজ্ঞাসাকে অনেকাংশে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। শরীর গঠনের ক্ষেত্রে 'আমি হাওয়ার শরীর'এর তাৎপর্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

© Santiniketan Sahityapath

বীতশোক ভট্টাচার্যের অসাধারণ প্রাণময়তার কথা যে কবিতার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাহলো তাঁর 'অন্য যুগের সখা' কাব্যগ্রন্থের 'আরতি'। এই কবিতার মধ্যে কল্পচিত্রের নানা বিন্যাসের অভিনবত্ব প্রতীয়মান। কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"আরতিশিখা জ্বলে এ রাতে পিত্তলে।
নারীর দুই হাতে ও তার কটিদেশে
আকৃতি কৃশ স্বরে 'আমারে লহো' বলে।
আমিও ধীরে তুলি আদরে ভালোবেসে
তরুণী দীপতরু, আলোয় গান শুনি:
হৃদয়, কই তার, পাষাণ। ফুলগুলি
জানু ও জঙ্ঘায় অযথা। অঙ্গুলি —
ছড়ানো পুরোহিত অথচ কাছে এসে
শীতে ও জ্বরে জ্ব'লে রক্তে ফাল্গুনী
ভেবেছে এনেছিল। সে হিম পদতলে
আজও তো হাত রাখে; কী করে তবে ভুলি:
আরতিশিখা জ্বলে এ রাতে পিত্তলে..."[১২]

প্রদীপ জ্বালিয়ে দেব-দেবীর মূর্তি বয়ণ প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিকভাবে আরতি বলে। 'আরতি' শব্দের সঙ্গে রয়েছে 'রতি' শব্দটি। 'আরাত্রিক' শব্দ থেকে আরতি শব্দটি এসেছে। 'আরত' শব্দের অর্থ অনুরক্ত বা আসক্ত, নিরত এবং যে রতিকর্মে দক্ষ। নারীর নিজেকে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা এবং তার রূপ বিন্যাসের পারম্পর্য এ কবিতার মধ্যে মূর্ত। 'আরতি শিখা' শব্দবন্ধটি আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে আকর্ষণ করে।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-প্রীতির অন্যতম স্বাক্ষর হলো তাঁর 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের 'অসময়' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সব সময়ই কবি বীতশোককে খুব আকৃষ্ট করতো। আর 'অসময়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি জনপ্রিয় গান 'আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি'র অনুষঙ্গ আছে। এছাড়া এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনুষঙ্গও এসেছে। এবার কবিতাটি উল্লেখ করা যাক —

"তোমার মল্লিকাবনে যখন সে ধরেছিল কলি
এ গানের কলি ছাড়া তোমার শরীর কিছু নেই
তুমি এই স্থির জেনে কেন যেন অস্থির হয়েছ
জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে একবার রবীন্দ্রজীবনী
একবার অভিধান খুলে খালি এইটুকু দেখে নিতে চাও
রবীন্দ্রনাথের এক মেয়ে ছিল তারও নাম বেলি
বেলফুল নামে ফুল মানে আর কিছু নয় এই মল্লিকাই"[১৩]

সাত পঙক্তির কবিতা। বিজোড় সংখ্যক পঙক্তিতে লেখা কবিতায় রবীন্দ্র জীবনীর কথা স্মরণ করা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রথম শব্দটি বদলে গেছে। বীতশোকের একাধিক কবিতায় 'মা' প্রসঙ্গ কিংবা মাতৃহারা সন্তানের আকুতির কথা আছে। তবে তাঁর 'নতুন কবিতা' কাব্যের 'হারমোনিয়াম'[১৪] কবিতার মধ্যে মায়ের কথা, মা না থাকার কথা দারুণ ভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

'নতুন কবিতা' বইয়ের 'বিয়ে' কবিতাটি কল্পচিত্র গগনে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের স্মারক হয়ে উঠেছে। দুই সত্তার একসূত্রে মিলিত হওয়ার নাম বিয়ে। একসূত্রে নয় দুই সরলরেখার মতো তারা এক বিন্দুতে এসে মিলে যাচ্ছে। সরলরেখা সোজা সমান্তরাল ভাবে না গিয়ে পরস্পরকে ছেদ করে ফেলছে। কবিতাটি এ রকম:

"ধরে নিলাম সোজা সরলভাবে —
রেখা দুটি সমান্তরাল যাবে।
কিন্তু ধরো সরলরেখায় গিয়ে
অন্য কোথাও, ভিন্ন কোনওখানে
তার মানে কী ওরা দুজন জানে
একাগ্র মুখ মুখের কাছে নিয়ে
যা দেওয়া যায়: সঠিক ক্ষতিপূরণ।
এবং ধরো, বুকের খাঁজে এমন
আটকেছে বুক, তেমনই হাঁটু দিয়ে
আঁটা দুটি হাঁটুর ঘাটে ঘাটে;
হুবহু দুই বাহু দুটি হাতে;
সন্দেহ নেই শরীর এর ওর দেহে
ছেদ করে এক অসীম বিন্দুতে।
এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির নাম বিয়ে।"[১৫]

দুটি সরলরেখা যাত্রা করে সরলভাবে অর্থাৎ সোজা। সরলরেখা যখন সমান্তরাল হয় তখন তা কখনোই পরস্পরকে ছেদ করে না। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে এ দুটি সরলরেখা অন্য কোথাও বা ভিন্ন কোনোখানে একাগ্র মুখ, মুখের কাছে নিয়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যা দেওয়া যায় তা দিতে গিয়ে থমকে গেল; মিলে গেল। শুধু মুখ নয় — বুকের খাঁজেও আর এক বুক আটকে থাকল। তেমনিভাবে দুটি হাঁটুর ঘাটে ঘাটে আর দুই হাঁটু এঁটে গেল। মুখ, বুক, হাঁটু নয়, আটকে গেল দুটি বাহুও। দুটি বাহু দুটি হাতে আটকে থাকল। এর ওর দেহে শরীর এভাবে মিলে গেল, থাকল না মাঝে কোনো সন্দেহ। এভাবে অসীম এক বিন্দুতে দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করল। এই জ্যামিতিক স্থানাঙ্ক নিয়ে 'বিয়ে' নাম চিহ্নিত করল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের একটি গানের প্রথম লাইন দিয়ে শুরু হয়েছে — 'নতুন কবিতা' কাব্যের 'পাঠ'[১৬] কবিতা। এই কবিতাটির রচনাকাল নয়ের দশক। কবি বীতশোক অভিনব আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন এ কবিতা যা সনেটের সংরূপে সংবদ্ধ। অষ্টক এবং ষটক অর্থাৎ প্রথম স্তবকটি আট পঙক্তির এবং দ্বিতীয় স্তবকটি ছয় পঙক্তির। প্রতিটি পঙক্তির চোদ্দটি করে মাত্রা রয়েছে এবং কবিতাটি চৌদ্দ (১৪) পঙক্তির। কবিতার মিল এরকম: কখ, কক, খক, খখ, গঘ, গঘ, গঘ।

'নাও' কবিতাটি 'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা। এখানে মনের গতির কথা ব্যক্ত হয়েছে, 'নাও'এ হাওয়ার উড়াল দিয়ে:

"যদি হাওয়া আসে
শাক্ত পদাবলি থেকে আবার ভাঙিয়ে নেব 'বাদাম' শব্দটা
ফের লোকগীতি থেকে যেন সুবাতাসে
কোথায় উড়াল দেব না থাকুক হাল টুটাফুটা
টাঙাব একটা পাল না থাকুক পাল আমি তাও

© Santiniketan Sahityapath

বদর বদর ব'লে নিছক অভ্যাসে
সুন্দরবনের দিকে ঠেলে দেব এই মনপবনের নাও।"[১৭]

প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ, পঞ্চম-সপ্তম পঙক্তিতে অন্ত্যমিল আর তৃতীয়-র মিলে অর্থাৎ প্রথমের মিল ফিরে এসেছে আবার ষষ্ঠ পঙক্তির শেষে। শাক্ত পদাবলির 'বাদাম' শব্দের অর্থ নৌকার পাল। ফারসি শব্দ এটি। বীতশোকের 'নাও' কবিতাটির বিশিষ্টতা কবিতাটির উৎকৃষ্ট মিলের বিন্যাস।

'নীল এক পাতা' কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'কোজাগরী' বীতশোকের কাব্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। 'কোজাগরী' শব্দের মধ্যে কে জাগে — এই প্রশ্নের দীপ্তি নিহিত আছে। কোজাগর থেকে 'কোজাগরী'। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাকে কোজাগর তিথি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দিনটি লক্ষ্মীপূজার দিন হিসেবে চির প্রসিদ্ধ। এ কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে স্মৃতির ক্রমশ অতীতলোকে যাত্রার প্রয়াস। সুখপাঠ্য কবিতাটি হলো:

"তোমার কি মনে আছে গত বছরের লক্ষ্মীপুজোর দিনটিতে
আমরা দিই নি পুজো, এক মন্দিরের থেকে আর-এক মন্দিরে
খুঁজে খুঁজে চলে গেছি: দূর থেকে কাছে এসে আরোই নিভৃতে
চলে যেতে গিয়ে খালি গর্ভগৃহে দাঁড়িয়েছি, তাকিয়েছি ফিরে
এ ওর চোখের দিকে... দেবীর মুখের দিকে আয়না ধরে দিতে
পুরোহিত ভুলে গেছে: আসলে পূজারি নেই; প্রতিমাও ধীরে
অন্তর্হিত হয়ে গেছে; আমাদেরও পুজো নেই। মন্দিরের ইটে
উৎকীর্ণ জীবনশিল্প অমরতা হয়ে আছে আমাদের ঘিরে।
এ পোড়ামাটির কাজ কাদের যে; কারা এই মন্দির বানাল:
বলার আগেই চোখ বাইরে গিয়েছে সরে-লালমাটি ঢেউ
দিকের শেষের দিকে নীল আকাশে ভেঙে গেছে। দেওদীন কেউ
মন্দির গড়েছে নাকি, তারও সুতনুকা ছিল; সেদিনের আলো
আজ মুছে গেছে কিনাএ কোজাগরীতে সব ভুলে যাওয়া ভালো।
তবু কেন মনে হয় তোমার কি মনে আছে সেই দিন, সেই তোমাকেও।"[১৮]

এইভাবে ক্রমশ স্মৃতির ভেতর সঞ্চরণ করবার নিপূণ ধরনে কবিতাটির শুরু হয়েছে। কবিতাটিকে একটি সাধারণ প্রেমের কবিতাও বলা চলে। কবিতায় প্রেমের মধ্যে চেতনার জাগরণ, জিজ্ঞাসা, আত্মজিজ্ঞাসা, পথ অন্বেষণের সাধনা এবং আত্মসন্ধানের ভাবনা নিহিত আছে। নিজের মধ্যে নিজের অন্বেষণ — এইসব প্রশ্ন ও উত্তর সন্ধানের মধ্য দিয়েই এ কবিতা অগ্রসর হয়েছে। গঠন বিন্যাসের দিক থেকেও কবিতাটি অসাধারণ সার্থক। বাংলা ভাষায় ভাবকে কতটা মসৃণ এবং আন্তরিকভাবে প্রকাশ করা যায়, তা কবি বীতশোক তাঁর নিজস্ব স্টাইলে উপস্থাপন করেছেন।

'নীল এক পাতা' বইয়ের 'অন্য আমি' কবিতার মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের আভাস অনুভব করা যায়। কবিতাটিতে এক অভিনব অভিজ্ঞতা ধরা আছে। কবিতাটি হলো:

"তোমার প্রেমে পড়েছিলাম আমি,
ভালোবেসেছিলাম তোমার নাম
সায়ং-প্রাতঃ এবং দিনযামী
পেরিয়ে রাত এখন মধ্যযাম।

© Santiniketan Sahityapath

গাছের সারি, জোনাকি-জ্বালা পথ
পেরিয়ে এলাম-নিরন্ত সব তারা।
অন্ধ মোড়ে সাক্ষ্য দিয়ো বট:
কষ্ট দেয় তোমায় কে বা কারা।
নই আমি আর বিমর্ষতার মূল;
সে-অসহায় সে নিরুপায় কে গো?
আরও বোবা, আরও লাজুক ভুল
কেবল তুমি শুধরে নিতে থেকো।
সদর খুলে দেখবে টালুমালু:
আমার চেয়ে নরম, অনেক ভিতু,
আমার চেয়ে অধিক ঈষাল, —
তোমায় পেয়ে অন্তত সে জিতুক।"[১৯]

'তোমার প্রেমে পড়েছিলাম আমি' — অতীতবাচক দুই বিশেষ্যের ক্রিয়া দিয়ে প্রেমের অভিজ্ঞতার যাত্রা। চার পঙক্তির চারটি স্তবকে গঠিত কবিতাটি। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কবি সত্তার সম্পর্কের জটিল ঘেরাটোপ এ কবিতায় প্রতিবিম্বিত করেছেন।

মহাভারতের রুরু-প্রমদবরা কাহিনির ছায়া অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে বীতশোকের 'নীল এক পাতা' বইয়ের 'রুরু'[২০] কবিতা। 'মহাভারত'এর কাহিনিটি বীতশোকের কবিতায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে — যা আমাদের নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে শেখায়। এই কবিতায় বীতশোক ভ্রাতা-ভগিনী, প্রেমিক-প্রেমিকা, মাতা-পুত্র অর্থাৎ তিনটি জোড় সম্পর্কের তাৎপর্য নিহিত করেছেন।

'দ্বিরাগমন' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়, জুলাই ১৯৯৭এ। এই কবিতা গ্রন্থ বীতশোক ভট্টাচার্যের কাব্যমালায় বেশ স্বাতন্ত্র্যসূচক। কবি এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় ভারতবর্ষের চিরায়ত ইতিহাস এবং লোকায়ত জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিচারে 'ডাক'[২১] কবিতাটির কথা বলা চলে। কবি বীতশোক ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখের মতো স্বদেশের পুরাণ, ইতিহাস, রাজনীতির ভেতর থেকে নিজের দেশ নতুনভাবে আবিষ্কার করেন তাঁর 'সংবেদ' কবিতায়। কবিতাটি এরকম:

"তার হাসি জলধনু বেঁকে
মাটি থেকে আকাশ জাগাল।
তার হাসি প্রতিধ্বনি থেকে
শব্দময় প্রতিফল: আলো।
কান্না তার দূরের তারার —
ঢাকা শেষবিকেলের মেঘে।
কান্না তার রঙিন ছাতার
নিচে বেলা সারা দিন জেগে।"[২২]

পুরাণ, ইতিহাস আর লোকায়ত চেতনার গভীর অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে বীতশোকের এই কবিতা। কবি যেন পাঠককে হাসি কান্নায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের শিল্প সৃজন সম্পর্কে অনেকগুলি তথ্য পাওয়া যায় 'যাত্রা' কবিতায়। কবি এখানে নিজের প্রস্তুতিতে যথেষ্ট আস্থাশীল। একটা প্রসঙ্গের টানে আরেকটা অনুসঙ্গ চাকার গায়ে চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। এই উঠে আসা হলো কবির গভীর মেধা ও প্রজ্ঞার অভিজ্ঞান:

"পাতার ওপর রোদ পড়েছে, পাতার ওপর ছায়া;

© Santiniketan Sahityapath

মাটির ওপর নকশা আছে মেলা:
গাঁ পেরিয়ে মেলায় এসে মেয়েরা যেন আহা
গলা জড়িয়ে কাঁদছে বিকেলবেলা।
কাঁপছে ছায়া, থামবে কেঁপে শেষ বিকেলের আলো;
অন্ধকারে নদীতে আর নদীতে হবে দেখা;
অন্ধকারে বোনকে ছেড়ে বোন রে কাঁদিস না লো।
একলা চলে শালের বন ঝিঁঝির ডাকে একা।”[২৩]

‘যাত্রা’ কবিতা প্রসঙ্গে সমালোচক ড. নিতাই জানা মহাশয়ের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ: “আপাতদৃষ্টিতে যেন নিছক প্রকৃতি অথবা লোকায়ত বাংলা দেশের জলরঙের একটি ছবিকে টান টান মেলে ধরে এ কবিতা। কিন্তু একটু ভেবে বা পুনরায় পাঠের পর অবাক বিস্ময়ে এর ভেতরের নানা কারুকাজ পাঠকের চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তখন বোঝা যায়, সামান্য এই ছবির পেছনে অনেক জানা, চেনা, দ্যাখা, পাঠ ও মেধা আছে। আর এখানে স্পষ্টতা পায় একজন উত্তর আধুনিক এবং পোস্টমডার্ন চিত্রশিল্পী, সমাজ-ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞানীর মেলবন্ধন। সেই সঙ্গে এ কবিতায় এসেছে পারিবারিক ভালোবাসা-মায়া-মমতার স্মৃতি।”[২৪]

‘দ্বিরাগমন’ কাব্যগ্রন্থের ‘পদাবলী’ কবিতায় রাধা-কৃষ্ণ, চৈতন্য এবং আরো নতুন ভাবজগতের সুগভীর দ্যোতনা রূপায়িত হয়েছে পদাবলীর আঙ্গিকে। দৃশ্যপট রচনা চরিত্র চিত্রণের স্বাতন্ত্র্য এই কবিতাটিকে আধুনিক বৈষ্ণবপদের পূর্ণতা প্রদান করেছে। কবিতাটি:

“তুমি কে? বলেছে রাধা। আর কোনও পায় নি উত্তর।
ঘন কালো মেঘ নাকি কিছু নেই এরও জবাব।
যেন জানে সইদের সবই বলা রাধার স্বভাব।
রাধা কি অলকমেঘ — ঘন কালো মেঘের ভেতর।
কৃষ্ণ তা জানে না। বর্ষা। ঘাসে জলে ঢেকে যায় পথ।
পাঠরত পুরোহিত, আসলে সে গলাতোলা ব্যাঙ।
রাজার কুমার ও কি, ছদ্মবেশে করে যোগ ধ্যান:
রাধা শোনে, আর ভাবে। ভাবনায় শেষ এই পদ।”[২৫]

কবিতাটি ভাবঘনত্বে বিশেষত্ব লাভ করেছে। রাধা-কৃষ্ণ, মেঘ, ঘন বর্ষা, ব্যাঙ — সবকিছু নিয়ে সংক্ষিপ্ত পঙক্তির দুটি স্তবকে কবিতাটি রচিত। ‘পদাবলী’ কথাটির মধ্যে ‘পদ’ শব্দটি গান বা গীতিকে বোঝায়। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের এই ‘পদাবলী’ আসলে বৈষ্ণবীয় ভাব দ্যুতিতে সম্পৃক্ত এক নব বৈষ্ণবপদ।

‘বসন্তের এই গান’ কবিতা গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৪০৮ (ইংরেজি ২০০১)। প্রকাশক — অমল সাহা, সৃষ্টি প্রকাশন। এই কাব্যের প্রচ্ছদ পট নির্মাণ করেছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় সুব্রত চৌধুরী। কবি কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন, তাঁর সহধর্মিণী ‘কবিতা’কে অর্থাৎ কবিতা ভট্টাচার্যকে। এই কবিতা গ্রন্থে সবমিলিয়ে ২৩ টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। এক কথায় এই কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় উঠে এসেছে — বাঙালির প্রথম প্রেম, পরিণত প্রেম, গোপন প্রেম, পরকীয়া প্রেম, নিষ্কাম প্রেম এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের গহীন গোপন দ্বন্দ্ব। ‘বসন্তের এই গান’ কবিতা বইয়ে বসন্ত ভাবের দুটি কবিতা আছে — এক ‘বসন্তের এই গান’ নাম কবিতা, অপরটি হলো এই কাব্যের শেষ কবিতা ‘এই বসন্তে’। ‘বসন্তের এই গান’ কবিতা টি বেশ দীর্ঘ। মোট ১৮৪ পঙক্তির। দ্বিতীয় কবিতা অর্থাৎ ‘এই বসন্তে’ কবিতা ‘বসন্তের এই গান’ কবিতার তুলনায় অনেক কম দৈর্ঘ্যের। এতে মোট ২৪ টি পঙক্তি সংযোজিত। কবিতাটি নিম্নরূপ:

“এই বসন্তে

© Santiniketan Sahityapath

বাতাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা বর্ণাঢ্য বাষ্প
এই বসন্তে
তোমার বর্ণান্ধ চোখে ছিটকে এসে লাগা রঙিন শীকরকণা
উৎক্ষিপ্ত এমন বর্ণিল প্রপাত
মেঘাবলীন রঙের ঝরনা এরকম
এত বর্ণময়
ধরো এই কাঞ্চন এই রাধাচূড়ো এই গুল্মোর
এই পলাশ এই রক্তজবা, অথবা একথোকা
বুকের ওপর লুলুণ্ঠিত হৃদয়,
বসন্তের উলুধ্বনি এই বুকের ভেতর
নিঃশব্দ
জলভরনের শব্দ তোমার না
না বিচিত্রিত কলস না তোমার
না বিম্বিত ধ্বনিময়
বর্ণময় এ হৃদয়, বরং
এই বসন্তে
জলরঙের বিহ্বল ধারায় ভাসমান, অথচ
বাতাসের উতল ধাক্কায়
এখনই ডুবে মরতে উন্মুখ
ক্রমশ দূরাগত এক মাঙ্গালিক কলসের স্তব্ধতা
আর শুভ্রতা তোমার গ্রীবার
এবং একঢাল চুল তোমার
অন্ধকার'' ২৬

'বসন্তের এই গান' গ্রন্থের শেষ কবিতা হলো 'এই বসন্তে'। এতে বসন্তের নানান অনুসঙ্গা বর্ণময় রঙিন জগতের রূপ চিত্রিত হয়েছে, অসাধারণ ধ্বনিময়তায়। এখানে ধ্বনি তরঙ্গের উত্থান-পতনে বর্ণময়তার আলিঙ্গানে হৃদয়ের বসন্ত ভাবাবেগ কবি দারুন রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বসন্তের এই গান' কবিতা গ্রন্থের এক ভিন্ন ভাবধারার কবিতা হলো 'দশমী' নামাঙ্কিত কবিতাটি। এতে শাক্ত পদাবলির বিজয়ার প্রসঙ্গা এসেছে। 'দশমী' কবিতায় নানা অর্থের দ্যোতনা মুখরিত হয়েছে। কবি অত্যন্ত দক্ষতায় দশমী দুর্গাপূজার বিদায় কালের তাৎপর্যে বিজয়া দশমীর গানের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। এখানে কবিতাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন:

''আতুর বিরহের গান
একা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে
অঞ্জলি পেতে।
এই তোমার পত্রপুট, অপর্ণার
জন্য বিজয়ার গান, জয়ার
জন্য বিজয়ার গান, এই

© Santiniketan Sahityapath

আর্ত গানের কলি:
রজনীগন্ধার এক গুচ্ছ
জ্যোৎস্নায় ঝরে-পড়া আঘ্রাণ—
আট বছরের গৌরীর জন্য একবার,
পরের বার ন-বছরের নগ্নিকার জন্য,
দশক শতক পার হয়ে...
অনার্তবা এক কুমারীর জন্য আবারও
পূর্ণিমার দিকে
অন্ধকার এক কুট্‌মলের যাত্রা,
আভাসিত এক মণ্ডলের দিকে।"[২৭]

এ কবিতায় আবার বিজয়াতে বেরোনোর শারদোৎসবের স্মৃতি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। এক প্রেমিকের প্রেমের গান নিবেদনের আর্তি, আর্ত প্রেমের গান বাণীরূপ লাভ করেছে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী হয়ে পূর্ণিমায় পৌঁছনোর সূত্রে এক নারীর ক্রম-পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে।

'প্রদোষের নীল ছায়া' প্রথম প্রকাশিত হয়, বৈশাখ ২০০১। প্রকাশক: সুবল সামন্ত, এবং মুশায়েরা প্রকাশনা সংস্থা। এই বইতে বিভিন্ন বিষয়ের ৪৬টি কবিতা আছে। 'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো — 'জন্মাষ্টমী'। কবিতাটি ১৬ পঙক্তির। সুখপাঠ্য কবিতাটি হলো:

"তখন প্রায় রাত্রি ছিল না।
যখন তোমায় জন্ম দিল মা।।
কোলের উপর স্তব্ধ দুটি হাত।
চালের ওপর শব্দ ধারাপাত।।
কী লজ্জা, এই গরিব দেশেগাঁয়।
ঘোমটা টানে, আঁচলা ফেঁসে যায়।।
হঠাৎ সেই উঠল স্বরগ্রাম।
তোমার নাম, সারাটা রাত নাম।।
কিন্তু তখন মধ্যযাম না।
চোখের জল উজান যমুনা।।
কুকুর আর শেয়াল কেঁদে চলা।
কোলের ওপর কান্না এক দলা।।
অন্ধকারে গরাদ রাতারাতি।
অন্ধকারে বৃষ্টিধারা সাথী।।

অন্ধকার খুলল কারাগার।
তখন প্রায় রাত্রি নেই আর।।"[২৮]

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের জন্ম। তাই, সেই দিনটিকে জন্মাষ্টমী রূপে পালন করা হয়। এই কবিতায়, যুগাবতার কৃষ্ণের জন্মতিথির — জন্ম মুহূর্তের এক অসাধারণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজ ও দেশের, বাংলা তথা ভারতের গ্রামের দরিদ্র মায়ের সন্তান প্রসবকালীন বর্ষার চিত্র অনুভূতির ঋদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কবি বীতশোক ছন্দের দোলা এবং

চিত্র ও স্বরের অনবদ্য সহাবস্থানে এ কবিতাকে সপ্রাণ জীবন্ত এক কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এ কবিতা, কৃষ্ণ জন্মের সূত্রটি নানা মাত্রায় বহু অর্থ দ্যোতকতা লাভ করেছে।

'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যের 'নির্গ্রন্থ' কবিতায় বুদ্ধ এবং তাঁর সমকালীন ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি বীতশোক। ২৭ পঙক্তির দীর্ঘ এই কবিতায় প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বটিকে কবি প্রকরণে গ্রহণ করেছেন অতি সতর্কতায়। এবার কবিতাটি উল্লেখ করা যাক:

"এককালে মস্করী গোশালের শিষ্য ছিলাম আমি।
তাঁর মতো নিয়তিবাদী হতে পারলাম না, এই আমার নিয়তি।
ভালো লাগল না নগ্ন আজীবিকদের সঙ্গে আমৃত্যু মশকরা।
হলুদ ধটী পরে দেশে ফিরে এলাম, ভাবলাম অজাতশত্রু রাজাই জাতশত্রু।
ভালো লাগল না, আমাদের লিচ্ছবিবংশে রাজার সংখ্যা ৭৭০৭।
কেউ একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, এইসব অসংস্কৃত রাজা।
ভাবলাম কষায় পরব, শরণ নেব সংঘের।
অবাক কাণ্ড, আশি বছরের বুদ্ধ আমাকে দিল উপসম্পদা;
আমি তার শেষ শ্রাবক।
তারপর সুগত গেল, ভাবলাম ভালোই হলো।
ভালো লাগল না অভিধর্ম নিয়ে আনন্দ আর উপালির বিতণ্ডা।
এবার আমার ধর্ম আমার কাছে।
ভেবে ফিরে গেলাম বৈশালীতে।
ভেবেছিলাম প্রৌঢ় বিট হয়ে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।
কে বলেছে, বেশ করে তাই ওরা বেশ্যা।
রূপবান এক অনতিতরুণকে বারবার উলঙ্গ করেও ওদের ক্ষান্তি নেই।
ভাবছি তাহলে নগ্ন আজীবিকদের মধ্যে শান্তি আছে।
চাইলে ভিড়ে যাওয়া চলে দিগম্বর জৈনদের দলে।
হয়তো এতদিন মস্করী গোশাল বিগত, তার বন্ধু নাকি শত্রু মহাবীরও নেই
কিছুতে কিছু আসে যায় না, যাওয়া যায় গুরু সঞ্জয় বেলথিপুত্রের কাছে।
পকুধ-কাত্যায়নকে গুরু করে তার ককুদ নিয়ে খেলা করলে হয়।
কিংবা ফেরা যায় লিচ্ছবিদের মধ্যে;
অঙ্গে তোলা যায় বর্ম কবচ, মগধরাজের বিরোধিতার অঙ্গীকার।

জিতে এসে বিছানায় ডাকা যায় সন্তানের মাকে;
হেরে এসে সটান শুয়ে পড়া যায় শ্মশানে।
ভ্রূণ হয়ে ফেরা যায় জঠরে।
ভালো লাগে না, ব্রাহ্মণদের জন্মান্তরের ধারণায় আমার আস্থা নেই" [২৯]

© Santiniketan Sahityapath

এই কবিতায় একটি প্রত্যয় থেকে আর একটি প্রত্যয় উপস্থিত। মস্করী গোশাল এবং সেখান থেকে নিয়তিবাদ, নগ্ন আজীবক, মশকরা, দেশে ফেরা, নিয়তি। অজাতশত্রু থেকে রাজার সংখ্যা, সংস্কৃত থেকে অসংস্কৃত, বুদ্ধ, সংঘ, উপসম্পদা, শ্রাবক এভাবে কবিতাটি এগিয়েছে। আমরা এসবকে অনুসঙ্গ বলে থাকি। অনুসঙ্গের সূত্রে একটির পর একটি আগম।

ডিসেম্বর ২০০৩এ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় বীতশোক ভট্টাচার্যের 'জলের তিলক' কবিতা গ্রন্থটি। এই কাব্যের মধ্যে ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী হলেন সোমনাথ ঘোষ। আর কাব্যগ্রন্থটি বীতশোক উৎসর্গ করেছেন — 'সুধেন্দু মল্লিক শ্রদ্ধাস্পদেষু' মহাশয়কে। কবির বহু চর্চিত কবিতা গ্রন্থের অন্যতম হলো 'জলের তিলক'। বীতশোক ভট্টাচার্যের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, সাহিত্য-সমালোচক ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মহাশয় 'জলের তিলক' কাব্য প্রসঙ্গে বলেন — "জলের তিলক-এর কবিতাগুলো এতই পুরাণ-ইতিহাস-ধূসর, স্মৃতি-মেদুর, ধ্বনিময়, রেখাময়, এবং কখনো কখনো এমনই সাবলীল বিভঙ্গে অবিস্মরণীয় যে বারবার সেই ধূসর-মেদুর ধ্বনি-রেখা-স্মৃতিময় বিভঙ্গগুলোকে চোখের সামনে এনে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সমস্ত ছবিগুলো সম্পূর্ণ হতে না হতেই এমনই ভেঙে ভেঙে যায়, কিংবা বারে বারে মুছে যায় যে, সম্পূর্ণতার প্রত্যাশা কিংবা অপূর্ণতার বেদনা থেকেই যায় মনের মধ্যে।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অপর্ণার অনুসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় — 'জলের তিলক' কাব্যের 'অপর্ণা' কবিতায়। 'অপর্ণা' কবিতাটিতে আসলে অপর্ণার আত্মবলিদানের নতুন রূপ এঁকে দিয়েছেন কবি বীতশোক। কবিতাটি হলো:

"কাকভোরে কানে এলে রবীন্দ্রসংগীত
বেরিয়ে দরজা খুলে জয়সিংহ প্রথম দেখেছে:
সিন্ধ বকুল গাছ মন্দিরের-বকুলের গন্ধে বন্যা এলে—
হাত দিয়ে শাখা টেনে, কাণ্ডে গর্হিত ঝাঁকি দিয়ে,
একবার মুখ তুলে তাকে ঐ চকিত দেখেই
নুয়ে প'ড়ে সাজি ভরছে, ভরছেই সাজি;
গলা তুলে গাওয়া চলছে সেরকম রবীন্দ্রসংগীত।
এলো চুল মুখ ঢাকে পাগলি না ভিখিরি মেয়ের।
এ বয়সে মেয়েরা যে আইবুড়ো থাকে না কখনও।
এ সময়ে অঙ্গনারা পা রাখে না কেউ এ উঠোনে।
হয়তো ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় ভেবে
গিয়ে ফের শুয়ে পড়ে। নাক ডাকছে সেই রঘুপতি।
জয়সিংহ শুনতে পায় ঘুমের ভেতরে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত।"[৩১]

'পথের পাঁচালী' কবিতা নীলকন্ঠ পাখি, ঝোপ থেকে ঝোপে ছুটে যাওয়া প্রাণী, খরগোশ, নবীন পালিত, হরিহর, অপু, কাজলের কথা — কবি বীতশোক কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। কবিতাটি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মতো মানবতা ও গ্রাম জীবনের আবহ — অনুভূতিতে গড়া। 'জলের তিলক' বইয়ের 'মানসে, কৈলাশে' কবিতার দুটি অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করি এক বিসর্জন, দুই শিব। এখানে শাক্তগান ও বিসর্জন, গৌরীর বাল্য লীলা ও আগমনীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাছাড়া সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলির বাল্য লীলা পর্যায়ের প্রেক্ষাপটে কবিতায় নিবিড় ছায়া ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রসঙ্গ নিয়ে বীতশোকের লেখা 'শেষের কবিতা' কবিতাটি তাঁর 'জলের তিলক' বইয়ে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি হলো:

"একটি বই। আরও একটি। একটির পর, একটি।

খাড়া শিরদাঁড়া, সার-দেওয়া বইয়ের থাক। কে
কোত নামাজ আবিষ্কার করল বইয়ের তাক? পাঠাগার কার আবিষ্কার?
কাঠ থেকে কাগজ, কাঠ থেকে দরজা জানালা বইয়ের আলমারি।
কাঠবেড়ালি কিছু জানে না। দারুণ সব প্রশ্ন। কাঠবেড়ালি
ভাঙা আখরোটের দানা মুখে নিয়ে গাছে ওঠে, গাছ থেকে
নেমে আসে। দারুণ সব প্রশ্ন। লাবণ্যও কিছু জানে না।
এ পাতা-খোলা বলাকা-য় সকালের ওম, শিশিরের ভেজা, হাওয়া
লুকোচুরি খেলে। ছায়া পড়ে অমিত রায়ের। পেছনে
নিবারণ চক্রবর্তীর ছায়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া আরও পিছনে।
রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত খণ্ড প্রকাশ হয়। প্রকাশ পায়
প্রতিযোগিতায় সুন্দরী, সৌদামাটির সেন্ট, সাগরশীকরলিপ্ত
বাতাসের সুগন্ধ। আর, শেষের কবিতা, থাকে। আরও আতিথ্য থাকে
প্রেমের, আলোর।"[৩২]

বীতশোক ভট্টাচার্যের 'শেষের কবিতা' কবিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার সম্পাদক, কবি-বন্ধু সুবল সামন্ত মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে — "বীতশোকের 'শেষের কবিতা'টিও 'জলের তিলক' বইয়ের। এটিও আকারে ছোট। এটিও প্রেমের কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' আমাদের পড়া। অমিত লাবণ্যর প্রেম আমাদের বিশেষ পরিচিত। বীতশোক সেই চেনা জানা প্রেমকে অন্যভাবে ধরতে চেয়েছে"।[৩৩]

বীতশোক ভট্টাচার্যের এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও, বলা যায় যে, 'শেষের কবিতা' কবিতার নির্মাণ শৈলী স্বনির্মিত, সম্পূর্ণ নিজস্ব। নতুন নতুন বাক্ প্রতিমায় কবিতাটি শুধু মাত্র নতুন নয়, নতুনতর।

বীতশোক ভট্টাচার্য বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর কবিতার শক্তি ও সৌন্দর্য বিস্ময়কর। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম আবির্ভাবেই সাড়া জাগানো এই কবি নিরন্তর সৃজনশীল, নিরীক্ষামগ্ন, তাঁর মেধা-মনন ও প্রজ্ঞা শুরু থেকেই আজও পর্যন্ত একই রকম সুউচ্চ এবং অম্লান। কিন্তু বাংলা কবিতা পাঠকের একটি একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে কতজনই বা এই নিভৃতচারী কবির কথা জানেন? জানেন না, কারণ প্রচারের আলো কখনোই তাঁর মুখের ওপরে পড়েনি। বীতশোক সমাজ সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পরম্পরার আলোকে পথ হেঁটে, নতুন পথের সন্ধান করেন। প্রাচীন, মধ্যযুগ, আধুনিক, উত্তর আধুনিক, উত্তর-উত্তর আধুনিক এবং সমসাময়িক সাহিত্য চেতনা তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো খচিত হয়ে যায়। এই সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, জীবন দর্শনের মতো অন্তর্লীন। বীতশোক কবি জীবন ও ব্যক্তি জীবনকে একাকার করে কবিতাতে অদ্বৈত দর্শনের অভ্যুত্থান ঘটান; বিজ্ঞান ও জীবনের কেন্দ্রে থাকা মানুষকে কাছে ডাকেন। তার সখা হতে চান। বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা ঐতিহ্য পরম্পরা, গৃহী ও সন্ন্যাসী, প্রাপ্তি ও বিদায়, কাব্য ও কলার জগতে — আত্ম মগ্নতা ও সমাজ প্রতিবদ্ধতার মধ্যে অপূর্ব সেতু বাঁধ নির্মাণ করেছে বলে মনে করি।

তথ্যসূত্র:

১। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আনন্দে ফেরালে আজ/ তিনজন কবি', বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৪, পৃ. ১৩

© Santiniketan Sahityapath

২। 'কৃমি/ তিনজন কবি', বীতশোক ভট্টাচার্য, পরমা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৫৩
৩। 'পোস্টমর্ডান ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', নিতাই জানা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুআরি ২০০৭, পৃ. ১৬৩
৪। 'মা ও সন্তান জানে/ তিনজন কবি', পরমা প্রকাশিত, বীতশোক ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৪৯
৫। 'Come Near Water (Translation Pradeepan Dasgupta)', Beetashok Bhattacharya, Monfakira, 2283 Nayabad, Kolkata 700099, first Published: June 2018
৬। 'এসেছি জলের কাছে/ এসেছি জলের কাছে', বীতশোক ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুআরি ১৯৯৫, পৃ. ১৫
৭। ওই, পৃ. ৫
৮। 'কবিতা সংগ্রহ', ফল/ শিল্প, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, পৃ. ৬৬-৬৭
৯। 'কবিতা সংগ্রহ', ভোরবেলা / শিল্প, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, পৃ. ৭৯
১০। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', অপর্ণা শরীর নিয়ে/ অন্য যুগের সখা, বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৪, পৃ.২২
১১। 'কবিতা সংগ্রহ', ভাসান/ অন্য যুগের সখা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৭
১২। 'কবিতা সংগ্রহ', আরতি/ অন্য যুগের সখা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৭/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ২৭
১৩। 'কবিতা সংগ্রহ', অসময়/ নতুন কবিতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৫২-৫৩
১৪। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', হারমোনিয়াম/ নতুন কবিতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৪, পৃ. ৬৪
১৫। 'কবিতা সংগ্রহ', বিয়ে/ নতুন কবিতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৭৪
১৬। 'কবিতা সংগ্রহ', পাঠ/ নতুন কবিতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৭২
১৭। 'কবিতা সংগ্রহ', নাও/ নতুন কবিতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৭৮
১৮। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কোজাগরী/ নীল এক পাতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৪, পৃ. ২২
১৯। 'কবিতা সংগ্রহ', অন্য আমি/ নীল এক পাতা, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৩৩
২০। 'কবিতা সংগ্রহ', বুবু/ নীল এক পাতা, বীতশোক ভট্টাচার্য,এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১৩৩
২১। 'কবিতা সংগ্রহ', ডাক/ দ্বিরাগমন, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১১১
২২। 'কবিতা সংগ্রহ', সংবেদ/ দ্বিরাগমন, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১০৯
২৩। 'কবিতা সংগ্রহ', যাত্রা/ দ্বিরাগমন, বীতশোক ভট্টাচার্য,এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১০৫
২৪। 'পোস্টমর্ডান ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', নিতাই জানা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০১, পৃ. ১৬০

© Santiniketan Sahityapath

২৫। ‘কবিতা সংগ্রহ’, পদাবলী/ দ্বিরাগমন, বীতশোক ভট্টাচার্য,এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ১০৬

২৬। ‘বসন্তের এই গান’, এই বসন্তে/ বসন্তের এই গান, বীতশোক ভট্টাচার্য, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ৪৫

২৭। ওই, পৃ. ২১

২৮। ‘কবিতা সংগ্রহ’, জন্মাষ্টমী/ প্রদোষের নীল ছায়া, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ২১৩

২৯। ‘কবিতা সংগ্রহ’, নির্গ্রন্থ/ প্রদোষের নীল ছায়া, বীতশোক ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০১, পৃ. ২৪১

৩০। ‘এবং মুশায়েরা বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যা’, সুবল সামন্ত, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১২, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, পৃ. ১৫৪

৩১। ‘জলের তিলক’, অপর্ণা/ জলের তিলক, বীতশোক ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ২০

৩২। ‘জলের তিলক’, শেষের কবিতা/ জলের তিলক, বীতশোক ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪১

৩৩। ‘এবং মুশায়েরা বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যা’, সুবল সামন্ত, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১২, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, পৃ. ২৮৫

—

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath